দাদুর বাড়ি

শুজা রশীদ

শীতের প্রকোপ তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। কিন্তু শীত শীত আমেজটা বেশ ভালই লাগে। এক সন্ধ্যাবেলায় প্রায় সারাদিন বাসে কাটিয়ে আমরা এসে পৌঁছালাম কালিগঞ্জে। এখানে নদী পেরিয়ে ওপারে গেলে আরো মাইল পাঁচেক পথ পেরিয়ে আমার দাদুর বাড়ি। আগেই দাদুকে খবর পাঠানো হয়েছিলো, তার গরুর গাড়ি পাঠিয়ে দেবার কথা আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য। নদীর ওপারে গাড়ি নিয়ে দাদু বাড়ির মজুরদের কারো অপেক্ষা করার কথা। নৌকায় নদী পেরিয়ে ওপারে পা রাখতেই রাখাল ছেলেটির মুখখানা আমার নজরে পড়লো। তার নাম আলেক মিয়া। বয়েস পনেরোর বেশী হবে না। সে চমৎকার বাঁশী বাজায় এবং বাঁদরের মতো লাফ ঝাপ দিতে পারে। দাদুর বাড়িতে থাকাকালীন তার সাথেই আমার সারাদিনের একটা বড় অংশ কেটে যেতো। একদিন কাউকে কিছু না বলে আমাকে নিয়ে সে গরু চরাতে গিয়েছিলো বিলে। বাড়িতে মহা হৈ চৈ পড়ে গেলো। আমাকে আর কেউ খুঁজে পায় না। শেষে দাদীবুবু বুদ্ধি করে একজনকে পাঠালো বিলে আলেক মিয়ার কাছে। সেখানে আমার দেখা মিললো। আমি একটি ছোট কাঠি হাতে মহা তোড়জোড়ে কতকগুলি বাছুরের জীবন অতিষ্ট করছিলাম। সেই সন্ধ্যায় গরু নিয়ে বাড়ির ফেরার পর দাদু দহলিজে ডেকে পাঠালেন আলেক মিয়াকে। দাদুর ভয়ানক মেজাজ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভাইস প্রেসিডেণ্ট। অনেকেই তাকে সমীহ করে চলে। কথা বলেন কম এবং অকারণে কিছু বলেন না। এই ধরণের মানুষদের রাগ বোধহয় একটু বেশীই হয়। কারো গায়ে তাকে কখনো হাত তুলতে দেখিনি। কিন্তু সেইরাতে তিনি আলেক মিয়াকে একটা চড় দিলেন। সবার সামনেই দিলেন। কোন কথা বললেন না। আলেক মিয়া বিশেষ অবাক হলো না। সে যেন জানতই এমন হবে। এরপরে তার সাথে আমার সখ্যতা একটু কমে এলো। মাও আমাকে তার কাছ থেকে দূরে দূরে রাখতে চাইতেন। গ্রামের মেয়ে হলেও গ্রামের মানুষদের সম্বন্ধে তার বেশ ভয় ছিলো। তিনি সবসময় বলতেন গাঁয়ের মানুষ যেমন সরল তেমন দুষ্ট। মার ভয় হতো আলেক হয়ত রাগের বশে আমার কোন ক্ষতি করবে। কারণ সেই দিন আমিই জোর করে তার সাথে যাই। বেচারীর তেমন কোন দোষই ছিলো না। এর কয়েকদিন পরেই আমরা নাভারন চলে যাই। বেশ কিছুদিন পরে আলেককে দেখে আমার খুশী আর ধরে না। সে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলো। তার চোখের ছমছমানি অন্ধকারেও চোখে পড়লো। সে ভাঙ্গা গলায় বললো - এতো রাত করলি কেন তোরা? কখন থেকে তোর জন্যি বসি আছি।

বাবা-মা তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দেশের অবস্থা তেমন ভালো নয়। পথে রাতে চুরি ডাকাতি হবার সম্ভাবনা ভালোই। বাক্স পেটরা ঝটপট গাড়িতে তুলে রওনা দেয়া হলো। পথে এক দুঃসম্পর্কের চাচার বাড়ি পড়ে। সেখানে থেমে তাদের একজন বিশস্ত মজুরকে সাথে নিয়ে নিলাম আমরা। সে হারিকেন জ্বালিয়ে সামনে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই সে ভারী গলায় চিৎকার করে উঠে- কেডা যায়?

গরুর গাড়ির ছইয়ের নীচে মা আর রুশী জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমি পেছন দিকে পা ঝুলিয়ে বসা। বাবা কখনও গাড়ির পেছন পেছন হাঁটছেন, কখনো আবার লাফ দিয়ে পেছনে উঠে বসছেন। বেশ আগেই ঘন করে রাত নেমেছে। আকাশে সরু চাঁদ আর ঘন সাদা কালো মেঘের খেলা। নির্জন আদিগন্ত ফসলের মাঠের মাঝ দিয়ে সরু একটা সুতার মত মাটির পথ। তার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ি চলে ধীর গতিতে, চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ঝি ঝি পোকার ঐক্যতানের সাথে মিলে বেশ একটা সঙ্গীতের সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে দুই একজন সাইকেল আরোহী টুংটাং শব্দ তুলে আমাদেরকে পেরিয়ে যায়। দুই একজন কৌতুহলী হয়ে জানতে চায়- কোন গাঁয়ে যাওয়া হচ্ছে?

–গনেশপুরে। জবাব দেয় আলেক মিয়া নয়তো আমাদের পথপ্রদর্শক লোকটা।

–গনেশপুরে কাগো বাড়ি?

–হবিবর মোড়ল।

–ও।

–হবিবর মোড়লকে কেউ চেনে, কেউ চেনে না। তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আমাদের গাড়ি গাঁয়ের পর গাঁ পেরিয়ে যেতে থাকে। পিরোজপুরে এসে আমরা পশ্চিমমুখে রওনা দেই। দক্ষিণমুখী পথ ধরে আরো তিন মাইল গেলে মায়ের বাপের বাড়ি। আমার মামারা দশ ভাই। তাদের প্রত্যেকরই অর্ধডজন করে সন্তান। অনেকেরই বিবাহ হয়েছে এবং সন্তান হয়েছে। সম্পূর্ণ একটি গ্রাম তারাই দখল করে আছে। সেখানে গেলে আমার দিনগুলো ফুর ফুর করে কেটে যায়। আমার অনেকগুলি মামাতো ভাইবোনেরা আমাকে আর রুশীকে নিয়ে কি যে করবে বুঝতে পারে না। আমরা দল বেঁধে সারা পাড়া চক্কর দিয়ে বেড়াই। রাতে উঠোনে 'বুড়ীচ্চু' খেলি দলবেঁধে। চাঁদের আলোয় নদীর পারে চলে যাই মুদির দোকান থেকে তেঁতুল বিচির বিস্কুট কিনতে। সেখানে গেলে আমি যে স্বাধীনতা পাই তা আর কোথাও পাই না। তার প্রধান কারণ রানী আপা। বারো বছরের দুর্দান্ত মেয়ে। শুধু ঐ গ্রামে নয় আশে পাশের দুচারটে গ্রামের লোকজনও তাকে চেনে। সে পড়াশোনায় যেমন তুখোড়, খেলাধুলাতেও তেমনি গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে নেত্রী। তার সাথে যতক্ষণ আছি ততক্ষন কেউ দুঃশ্চিন্তা করতো না। সবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো রানী আপার উপরে। আমি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো বাবার দিকে তাকাতেই বাবা বললেন-যাবি, যাবি। তোর দাদুকে বলে যাবো, কিছুদিন পরে গাড়িতে করে তোদেরকে ক'দিনের জন্য দর্‌গাহপুরে পাঠিয়ে দিতে।

মা বললেন-ও তো তাই চায়। সেখানে গেলে সেই যে রানীর পাছ ধরবে সারাদিন তার দেখাই পাওয়া যায় না।

বাবা বেশ শব্দ করে হাসতে লাগলেন, তার শৈশব কৈশোর কেটেছে গ্রামে। বড়বোনের হাত ধরে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন খুব ছোটবেলা থেকেই। এই অনুভূতি তার খুবই বেশী।

দাদুর বাড়ির মাইলখানেকের মধ্যে আসতেই তিন-চারজনের একটি দলের সাথে আমাদের দেখা হলো। এরা সবাই দাদুর বাড়িতে কাজ করে। আলেকের বড় ভাই মতি, বাবা শহীদ, গ্রামের

অন্য দু'জন যুবক রহিম এবং লিয়াকত, তারা বাঁশের লাঠি আর হারিকেন জ্বালিয়ে বড় বড় পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো।

শহীদ চাচা অনেক দূর থেকেই চিৎকার দিয়ে ডাকলেন-আলেক নাহি? ও আলেক! আলেক!

আলেক প্রত্যুত্তরে সরু গলায় চিৎকার করলো-বাপজান!

তারা চারজন এবার দৌঁড়ে কাছে এলো। শহীদ চাচা বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন।

–এতো দেরী করলে। তোমার আব্বাজান খুব চিন্তা করতিছেন। শেষে আমাদেরকে পাঠালেন।

বাবা বাসের দেরি ব্যাখ্যা করতে করতে তাদের সাথে ফিরতি পথে হাঁটতে লাগলেন। শহীদ চাচা দীর্ঘদিন ধরে দাদুর জমিতে জন মজুরের কাজ করেন। তিনি দাদুর বাড়ির অবিচ্ছেদ্য অংশই হয়ে গেছেন। নিজের কোন জমি জিরেত নেই। দাদু নিজের ভিটে বাড়ি সংলগ্ন জমির এক কোণায় শহীদ চাচার জন্য খানিক জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে মাটির কুড়েঘর বানিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে থাকেন শহীদ চাচা এবং তার ছেলে মেয়েরা। তার দুই ছেলে মতি ও আলেক। মতি ভাই বছর কয়েক হলো বিয়ে করেছে। সেও ছোট্ট একটি কুড়ে ঘর তুলেছে শহীদ চাচার বাড়ির পাশে। বাবাকে তারা সবাই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। বাবা শুধু যে তাদের অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করেন এবং ঔষধ দিয়ে থাকেন তাই নয়, তাদের ভিটে বাড়ির ব্যবস্থাটা বাবাই ওকালতি করে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন দাদার কাছ থেকে।

দাদুর বাড়িতে আমরা যখন পৌঁছালাম তখন সারা গ্রামের মানুষ মনে হলো যেন উঠোনে ভেঙে পড়েছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামই গরীব অধ্যুষিত। খুব অল্প মানুষেরই শিক্ষা-দীক্ষা আছে। তারা অন্যের জমিতে বর্গা খেটে অন্নের সংস্থান করে। গ্রামের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সকলের কাছেই খুবই সম্মানের বস্তু। তাদের কেউ বেড়াতে এলে সবাই এক পলকের দেখা দেখতে ছুটে আসে। বাবার আগমনে এই ভীড় আরো বেশি হয়। ডাক্তারি পাশ করবার পর থেকেই বাবা গ্রামে এসে বিনা অর্থে গরীবদের চিকিৎসা করতেন। দূর দূর গ্রাম থেকে গরীব মানুষেরা চলে আসতো তার কাছে। তাদের অসুখও দেখানো হতো, ঔষধও কিছু মিলতো এবং ভালো মন্দ খাওয়াও জুটতো।

দাদী বুবু এসে আমাকে আর রুশীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বোঝাই গেলো আমাদের দেরি দেখে তারও খুব দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিলো। সেই রাতে সকলকে বিদায় দিয়ে রাতের খাবার সেরে ঘুমাতে ঘুমাতে রাতের অর্ধেকটা পার হয়ে গেলো। গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যে হলেই সবাই কেরোসিন বাঁচাতে বিছানায় চলে যায়। এর অনিয়ম সেখানে খুব অল্পই হয়। আমার বাবা অথবা চাচু যিনি সাতক্ষীরা শহরের নামকরা শিক্ষক, গ্রামে এলেই শুধুমাত্র নিয়মের ব্যতয় হয়।

পরদিন সকালেই বাবা চলে গেলেন। তাকে সেদিনই যশোর কোর্টে কেসে হাজিরা দিতে হবে সাক্ষী হিসাবে। যাবার আগে আমাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বললেন-তোমার মাকে আর বোনকে দেখে রেখো। ঠিক আছে?

আমি সদর্পে মাথা নাড়ি। এই সামান্য দায়িত্ব পালন করতে না পারার তো কোন কারণ দেখি না। বাবা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সাইকেলের পেছনে চেপে রওনা দিলেন। ঐ এলাকায়

এই বিশেষ যানবাহনটিকে বলা হয় হেলিকপ্টার। সাধারণ সাইকেলের পেছনের চাকার উপরে অতিরিক্ত একটি বসার জায়গা কাঠ দিয়ে মজবুত করে বানানো হয়। তার উপরে দুইদিকে দুই পা ছড়িয়ে বসতে হয় আরোহীকে। মেয়েরা সাথে না থাকলে এই বাহনই সকলে ব্যবহার করে থাকে। এটা অনেক দ্রুত। গরুর গাড়িতে পথ যেন ফুরাতেই চায় না। আমি হেলিকপ্টারের পেছন পেছন অনেক দূর দৌড়ে গেলাম। খুব ধীরে ধীরে বাবাকে নিয়ে সাইকেলটি গায়ের মেঠো পথে বিলীন হয়ে গেলো। অনেক দূর থেকে আবছায়ার মতো বাবাকে হাত নাড়তে দেখলাম। আমার চোখজোড়া ভিজে উঠলো। বাবাকে আমার কবে দেখবো কে জানে। যশোর থেকে তিনি চলে যাবেন কুমিল্লায়। সেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে। আমরা কখন সেখানে যেতে পারবো তার কোন ঠিক নেই। আলেক আমার পেছন পেছন দৌড়ে আসছিলো। সে আমাকে কোলে তুলে নিলো। কিছু বললো না।

কোর্টে বাবার সাক্ষ্য খুব সহজেই হয়ে গেলো। তাকে ডেথ সার্টিফিকেটটি দেখিয়ে জানতে চাওয়া হলো সেটা তার দেয়া কিনা। নিজের লেখা চিনতে বাবার অসুবিধা হয়নি। তাকে কোন পক্ষই আর তেমন কোন প্রশ্ন করল না। বাবা কোর্টে এর আগে কখনও যাননি। একটু ভয়ে ভয়েই ছিলেন। তার কোন ভুলটুল ছিলোনা কিন্তু তারপরও উকিলদের জেরার কি কোন মাথা মুণ্ডু থাকে। ঐ পর্ব ভালোয় ভালোয় কেটে যাওয়ায় তিনি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সেখান থেকে বাবা সেদিনই চলে গেলেন কুমিল্লাতে। পরদিন চাচুকে সাতক্ষীরায় ফোন করে জানিয়ে দিলেন যে তিনি নিরাপদে পৌঁছেছেন। সাতক্ষীরা থেকে দাদুর বাড়ি ঘন্টা দুয়েকের পথ। বাসে কালিগঞ্জ গিয়ে হেলিকপ্টারে দাদু বাড়ি। চাচু ছুটির দিনে চলে এলেন নিজেই খবরটা পৌঁছাতে। সাধারণত অনেকেই সাতক্ষীরা থেকে গ্রামে আসে প্রায় প্রতিদিন তাদের মাধ্যমেই খবর পৌঁছানো হয়। আমরা আসবার সময় সাতক্ষীরায় থামিনি ফলে চাচার সাথে আমাদের দেখা হয়নি। চাচু খুবই স্নেহপ্রবণ মানুষ। আমাকে আর রুশীকে দেখবার জন্যই যেন সুযোগ পেয়েই চলে এলেন। চাচী রয়ে গেলেন বাড়িঘর সামলানোর জন্য। তাদের চারটি মেয়ে সকলেই স্কুলে কলেজে যায়। ইচ্ছে হলেই দু'জনে মিলে বেরিয়ে পড়া যায় না। চাচু গ্রামে এলেই আমাকে তার সাইকেলের সামনে বসিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ান। তার একটা অভ্যাস গ্রামের মুরুব্বী এবং মাতব্বর ধরণের মানুষজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা। তাতে কোথায় কি হচ্ছে জানা যায়। তিনি আমাকেও সাথে নিয়ে যান এবং সকলের কাছে গর্বভরে পরিচয় করিয়ে দেন-আমার ভাইপো। রশীদের ছেলে। সালাম দাও বাবা।

আমি লাজুক মুখে ফিস ফিস করে সালাম দেই। অস্বীকার করবো না আমি একটু লাজুক ধরণের ছিলাম। পরিচিত মানুষদের মধ্যে থাকলে আমার ছুটাছুটিতে সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু অপরিচিত মানুষদের সামনে অতি পুরোদস্তুর ভেজা বেড়াল। সকলেই আমার নিরীহ, গোবেচারা ভাব দেখে খুবই মুগ্ধ। চাচু আমাকে নিয়ে গেলেন মোতালেব চাচার বাড়িতে। তিনি বাবার ফুপাতো ভাই। খুব বড়সড় কুস্তিগীরের মতো শরীর। ব্যায়াম করেন, লাঠি খেলেন। আমাকে তাক লাগানোর জন্য ইয়া লম্বা এক বাঁশের লাঠি নিয়ে কতক্ষণ শাই শাই করে চক্কর দিলেন। আমি চোখ গোল গোল করে এই অদ্ভুত মানুষটির কাণ্ড দেখলাম।

তার ছেলেমেয়ে কেউ নেই। গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদেরকে খুব পছন্দ করেন। বাড়িতে ডেকে ডেকে এনে গল্প শোনান, খেলা দেখান। এই গ্রামে তার বেশ নাম ডাক আছে। গ্রামের অনেকেই তাকে নেতা হিসাবে মানে।

সেখানে থেকে বিদায় নিয়ে রতনপুরের হাট অভিমুখে রওনা দেবার পর চাচু বললেন - লোকটি ভালো কিন্তু মেজাজটা খুব চড়া। শত্রুর শেষ নেই। অল্পেই মারধর করে। সেদিন নাকি এক বেয়াদপ ছোড়াকে ধরে বেধড়ক পিটিয়েছে। কোন মেয়েকে দেখে শিষ দিয়েছিলো ছোড়া। পরে জানা গেলো তার বাবা পাশের কোন গ্রামের বড় মাতব্বর। জামানা ভালো না। কিন্তু মোতালেবকে কে বোঝাবে?

আমি বোদ্ধার মত মাথা নাড়ি। চাচু সকলের সাথে এই সমস্ত আলাপ করেন না। আমি জানি, কারণ তিনি গ্রামে এলে তার ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকি। না থেকে উপায়ও থাকে না। চাচু আমাকে ছাড়া কোথাও যান না।

রতনপুর হাট মাত্র মাইল খানেকের পথ। গাছপালা ঘেরা অপ্রশস্ত মেঠো পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যখন হাটের সীমানায় পৌঁছি তখন নিজের অজান্তেই জিভে পানি এসে যায়। হাটের দক্ষিণপ্রান্তে বেশ কয়েকটা ময়রার দোকান। তার মধ্যে কমল ময়রার রসগোল্লা আর জিলাপীর কোন তুলনা হয় না। চাচু হাটে এলেই আমার কপালে মিষ্টি বরাদ্দ হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই আমার নাকি খুব মিষ্টি খাবার শখ। মা বলেন মাত্র দেড় বছর বয়েস থেকেই আমি এক থালা গুড় নেবার জন্য তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিতাম। থালাভর্তি গুড় না পাওয়া পর্যন্ত আমার কান্না থামতো না। কমল ময়রা আমাকে দেখেই বিশাল এক হাসি দেয়। তার বিরাট কড়াই ভর্তি শ্বেতধবল রসগোল্লা নাড়তে নাড়তে সে বলে - খোকা আজকে ক'টি খাবে? দু'টা দেবো না চারটে দেবো? ভালো জিলাপী আছে। একটু আগে বানিয়েছি। স্যার বাসার জন্য সের খানেক দিয়ে দেবো?

চাচু আমাকে নিয়ে আয়েস করে একটা টেবিলে বসেন। - দাও, দাও। খোকাকে আর আমাকে এখন দু'টা করে রসগোল্লা আর দু'টা করে জিলাপী জলদি দাও। বাসার জন্যেও সের খানেক দাও। ওর মাও তোমার মিষ্টি খুব পছন্দ করে।

- খোকারা এলো কবে?

- এইতো কদিন আগে। ওর বাবাকে পশ্চিম পাকিস্তান যেতে হবে ট্রেনিংয়ের জন্য। সেই ওদেরকে রেখে গেলো। মাস কয়েক থাকবে। ওর বাবা সেখানে গিয়ে বাসা ঠিক করে ওদেরকে নিয়ে যাবে। সন্দেশ খাবি খোকা? কমল, দাও দুটা প্যাড়া সন্দেশ দাও। ছেলেটা মিষ্টি খুব পছন্দ করে। পেটের মধ্যে কৃমির ডিপো। কিন্তু দু'একদিন খেলে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

- স্যার, আমার মিষ্টি খেলে কৃমি হয় না। এ হলো কমল ময়রার বিশেষ মিষ্টি। বুঝলেন না, স্যার! হে হে!

হাটের মধ্যেই দেখা হয় বইয়ের দোকানের মালিক রজব আলির সাথে। তার পাশের কাপড়ের দোকানটা নইসুর রহমানের। এরা সবাই চাচুর পুরান দিনের বন্ধু। তারা পড়াশোনায় বিশেষ

এগুতে পারেনি বলে ব্যবসাতে নেমে পড়েছেন। ব্যবসাপাতি খুব ভালো নয় কিন্তু এরকম চলে যায়। অল্প বিস্তর জমি জিরেত আছে। বর্গা দিয়ে বছরের অন্নের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু স্বচ্ছলতা কষ্টে অর্জিত হলেও তাদের নজর খুবই উঁচু দিকে। রাজনীতিতে তাদের ভয়ানক আগ্রহ। চাচুর সাথে স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে জোর আলাপ চলে। দেশের পরিস্থিতি নিয়েও কথা হয়। ভুট্টো গদি ছাড়বে না। গোলমাল একটা বাঁধবে। এই অঞ্চলে কেমন প্রভাব পড়বে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পাশেই ভারতের বর্ডার। তিন চার মাইলের বেশী দূরত্ব নয়। নদী পেরুলেই ভারতের ভূমি। তাদের কি ভূমিকা হবে কে জানে। কিভাবে মিটবে এই সমস্যা? এই সব আলাপ শুনতে শুনতে ঝিমুনি এসে পড়ে। চাচু লজ্জিত হয়ে পড়েন। - দেখো দেখি আমার কান্ড। ছোট্ট ছেলেটাকে সাথে এনে আমি রাজনীতির আলাপ জুড়ে দিয়েছি। চলো খোকা। আমরা বরং বাড়ি যাই।

আমরা ঘুরে ঘুরে সারা গ্রাম চষে অন্য পথ দিয়ে বাড়ি ফিরি। চাচুর সাথে ঘুরতে আমার ভালোই লাগে। নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কেউ মনে হয়। এমন জ্ঞানের কথা আমার সাথে আর কয়জন বলে?

শুজা রশীদ, টরেন্টো, কানাডা

বিঃ দ্রঃ

জনাব শুজা রশীদ প্রবাসে বসে স্বদেশে নিজের হারানো দিনগুলোকে নিয়ে 'দামামা' নামে একটি বই লিখেছেন। আসছে মে - ২০০৬ তিনি তা ছাপতে যাচ্ছেন। তার আগে আমাদের কর্ণফুলী'তে তাঁর এ অপ্রকাশিত বইটি ধারাবাহিকভাবে আমাদের অগনিত পাঠকদের জন্যে তিনি পরিবেশন করছেন।